এই সময়
সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো,
মন আলগা হলে যত গোল বাধায়।
— সারদা দেবী

বাস্তবানুগ

তর্কবিতর্ক পার করে, রাষ্ট্রপুঞ্জের জীববৈচিত্র সম্মেলনের ছত্রচ্ছায়ায়, ১৯ ডিসেম্বর মন্ট্রিয়লে ‘গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্ক’ (জিবিএফ) নির্ধারিত হল। তার তাৎপর্য দু’টি। পরিবেশের ক্ষতি রোধ করতে জীববৈচিত্র এখন খাতায়-কলমে জরুরি ব্যাপার হল, এবং যে চারটি উদ্দেশ্য ও তেইশটি লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার কথা বলা হয়েছে, তার কয়েকটি বাস্তবানুগ। জরুরিতর উদ্দেশ্য, বর্তমানে জীববৈচিত্র রক্ষার হিসাবটি স্থলভাগে ১৭% ও জলভাগে ১০%, যা উভয় ক্ষেত্রেই বেড়ে ৩০% হবে। ‘জীববৈচিত্র’ পরিভাষাটি বহুধাবিস্তৃত, তাতে এই পৃথিবীর সমস্ত জীব অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানীরা ১৬ লক্ষ প্রজাতির উল্লেখ করেন, যার অংশমাত্র অস্তিত্ববান। ৪০০ কোটি বছরের বিবর্তনের ফল জীববৈচিত্র, যাতে প্রাণের নানা রূপ এক সূত্রে গ্রন্থিত। যথা, বহু পতঙ্গ পরাগসংযোগে ভূমিকা পালন করে কৃষিকাজে সহায়ক। জীববৈচিত্র হ্রাসের তিনটি সরাসরি কারণ: জমির ব্যবহার বদল (৩০%), অতিরিক্ত ব্যবহার (২০%) এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ (১৪%)।

জীববৈচিত্র সংরক্ষণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরুদ্ধাচারী পদক্ষেপ ভাবলে ভ্রম হবে। উদাহরণ ভারতের ধান, ফলনের দিক থেকে যা সর্বাধিক গুরুত্ববাহী। ১৯৫০-৫১ থেকে ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে ভারতের ধান উৎপাদন পাঁচ গুণ বেড়ে বাৎসরিক ১১ কোটি টন। একই সময়ে ধান চাষের জমি ১.৪ গুণ বেড়ে ৪.৩১৯ কোটি হেক্টর। উৎপাদনশীলতা ও কৃষি অনুশীলনে অসাধারণ কিছু না-করেও ভারত এখানে পৌঁছেছে। প্রযুক্তি এখন এতই উন্নত যে, পঞ্চাশ বছর আগে যা ভাবাও যেত না, আজ তা হাতের মুঠোয়। জিবিএফ-এর একটি প্রস্তাব উল্লেখ্য। জীববৈচিত্রে ক্ষতিকর ভর্তুকি সংস্কারের কথা বলেছে নীতিটি। আপন স্বার্থেই ভারতের এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন প্রয়োজন, যা কেন্দ্র ও রাজ্য বিবেচনা করবে। অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষতি না-করে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বৃদ্ধির ভাবনা প্রযুক্তির প্রগতিতে অসম্ভব নয়। সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা কঠিনতর। জিবিএফ-এর লক্ষ্য, ২০২৫-এর মধ্যে গরিব দেশে অন্তত ২,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার বাৎসরিক তহবিল গঠন, ২০৩০-এর মধ্যে যা ৩,০০০ কোটি। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনে আর্থিক লক্ষ্যপূরণে ফাঁকটি সংশয় জাগায়। তা ব্যতিরেকে জিবিএফ-এর অনেক ভাবনাই বাস্তবানুগ এবং ভারতের পক্ষে জরুরি। আশান্বিত হতেই হয়।

প্রতারণা

মানুষকে ঠকিয়ে অর্থোপার্জনের ব্যবসাটি প্রাচীন। উন্নত সমাজব্যবস্থায় নগর পত্তনের সঙ্গে লোকগাথায় তো বটেই, নাগালের মধ্যে যেটুকু প্রকৃতি, এবং তার বাইরে যা কিছু, তা নিয়ে রূপকথাতেও চালাকির দ্বারা মহৎ কার্যসিদ্ধিতে বদ্ধপরিকর চরিত্রদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য রকম বেশি। অর্থাৎ, রাজা প্রজায় প্রশাসন, ব্যবসা, যুদ্ধ, শান্তি, অপরাধ, আইন, শান্তি, পারিতোষিক সামলানোর পর খানিকটা উদ্বৃত্ত বরাবরই চতুর-শ্রেষ্ঠ ঠক এবং ‘বোকাদের’ জন্য তোলা থাকে। আমোদ বহু গুণ বাড়ে যখন নাকানি চোবানি খাওয়া ব্যক্তিটি সে জগতের হোমরা চোমরা কেউ হন, অর্থাৎ, ক্ষমতাবানদের নাকাল করে সামাজিক বিন্যাসের অসামঞ্জস্যগুলিকে নিয়ে মস্করাও এর অন্যতম প্রধান লক্ষ। ইদানীং সে সুযোগ কমেছে কারণ চোরে কামারে দেখা প্রায় হয়ই না, দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানগুলি অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠায়। তার ফলে ঠকানোর প্রবণতা উবে গেছে বলা যাবে না। সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে ‘ট্রেন গোনা’র চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে এক ব্যক্তি বহু মানুষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ঠকিয়ে নিল। প্রবঞ্চকটির কী হবে, এ ক্ষেত্রে জরুরি প্রশ্ন নয়। যারা ওই রকম কাজ পাওয়ার জন্য টাকা দেয়, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েই বরং চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নির্বুদ্ধিতা বা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবার ক্ষমতা লোপ পাওয়াটি অপরাধ নয় কেন, সে প্রশ্ন এমতাবস্থায় মগজে উদয় হলে তা কি খুব একটা দোষের হবে?

অসংখ্যা

৫০০০০০০

(পঞ্চাশ লক্ষ)— রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসাবে জলবায়ু বদল ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গত বছর ভারতে ঘরহারা মানুষের সংখ্যা। সূত্র: ইন্ডিয়াটাইমস ডট কম

দিনকেদিন

২২ ডিসেম্বর

১৮৫৩: সারদা দেবী বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী ও ভক্তদের কাছে তিনি শ্রীশ্রীমা নামেই অধিক পরিচিত।

১৮৮৭: শ্রীনিবাস রামানুজন জন্মগ্রহণ করেন। গণিতের বিভিন্ন শাখায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর নোটবুক পরবর্তী কালের গণিতবিদদের মূল্যবান গবেষণার অঙ্গ।

আত্মস্বরূপ

স্বামী সারদানন্দ

বোধিবৃক্ষ

সহস্র সহস্র বৎসরেরও পূর্বের কথা— ইতিহাসের তখন জন্মই হয় নাই। তবে কালনির্ণয় আর করিবে কে? জগতের সেই প্রাচীন যুগের অতি প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে ইওরোপের বর্তমান কালের পুরাণজ্ঞ সূতকুল এই কথা বলিয়া থাকেন। বর্বরজগৎ তখন অজ্ঞানপ্রসূত নিবিড় অমানিশা-সমাচ্ছন্ন। যে দিকে যতদূর দেখ, তমঃশক্তির সহিত রজঃশক্তির ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানবের মানসপিণ্ডময় স্থূল দেহাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন অথচ তদন্তর্গত মনের ন্যায়, বহিঃপ্রকৃতির স্থূল সৃষ্টির অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি— মানব-মানবীকে অধিকার করিয়াই পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত।

প্রথম ক্ষুধার তাড়না, দ্বিতীয় অত্যধিক শীত, বাত, উষ্ণতাদি ও বন্যা পশ্চাদির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা, তৃতীয় আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি নানা প্রেরণায় মানব-মানবীর অন্তর্নিহিত রজোগুণ ক্রমশঃ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। আহারের নিমিত্ত ফলমূল অন্বেষিত হইল, যখন তাহা জোটা কঠিন হইল, তখন পশু-বধ ও মাংস ভোজন চলিতে লাগিল। গিরিগুহা, মৃতস্তূপাদির সন্ধান এবং পরে শীতনিবারণ ও বাসের জন্য তদনুকরণে পূর্ণাচ্ছাদন রচিত হইল। হে দেবি মানবি, তমোগুণময়ী হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিলেও তখন হইতেই তুমি সেই বর্বর নরের সহচরী।

(‘গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা’ থেকে গৃহীত)

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর, দিল্লিতে ভয়াবহ গণধর্ষণ, এবং তার পর সরকারের তরফে ঢালাও প্রতিশ্রুতি

নির্ভয়াকাণ্ডের এক দশক, দেশ কতটা নিরাপদ?

নারীকল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি বরাদ্দ যৎসামান্য বাড়লেও প্রতিশ্রুতি পূরণে যা দরকার, তার সঙ্গে বাস্তব ব্যয়বরাদ্দের বিস্তর ফারাক। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

আইস্টক

ঠিক এক দশক হল নির্ভয়ার ঘটনার বা দুর্ঘটনার। তবুও সংবাদপত্র খুললেই দেখি ‘কেরালার নির্ভয়া’, ‘গোহপুরের (আসাম) নির্ভয়া’, ‘রোহতাকের (হরিয়ানা) নির্ভয়া’, এ রকম সব শব্দবন্ধ। ওই স্মৃতি আজ বীভৎস নির্যাতনের একটি মাপকাঠি, কিন্তু শাস্তি দেওয়ার নয়। গত মার্চ মাসে রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানায় যায় ভারতে ধর্ষণে শাস্তির হার ২০১৮ সালে ২৭% থেকে ২০২০ সালে ৪০% হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, ১০২৩টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরির লক্ষ্যমাত্রা হয়তো তার ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছে। এর মধ্যে ৩৮৯টি কোর্ট শুধুমাত্র পকসো মামলাগুলোকে দেখবে, অর্থাৎ নাবালক-নাবালিকাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি। ২৭টি রাজ্য আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ৭০০টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট কাজ করছে, যার মধ্যে ৩৮৩টিই হচ্ছে পকসো কোর্ট, অর্থাৎ সরকার শিশুদের যৌন নিপীড়ন কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না। অন্যান্য বয়সের মেয়েদের যৌন নিগ্রহকে সরকার কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে? যদি শাস্তির হারকে আমরা বয়স অনুপাতে ভাঙি, তা হলে দেখব যে ৪০% শাস্তি হচ্ছে, তার প্রায় আশি ভাগ শিশু আর নাবালিকাদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আদালতও শিশুদের যৌন নিগ্রহে তাদের বয়ানকে যতটা বিশ্বাস করছে, সাবালিকাদের ক্ষেত্রে তা করছে না। তা হলে তেইশ বছরের যে ছাত্রী দিল্লিতে বীভৎস গণধর্ষণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েও আজ নির্ভয়া হিসাবে মানুষের মনে রয়ে গেছে, সে যদি আজ বেঁচে থাকত, তা হলে কি আজ সে বিচার পেত? নির্ভয়ার বীভৎস মৃত্যুর ঠিক এক দশক পরে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য কী ব্যবস্থা আর যদি বা ঘটে যায়, তা হলে তার বিচার এবং অপরাধীর শাস্তির কী ব্যবস্থা হবে?

সরকারের ভূমিকা

নির্ভয়ার ঘটনার পরে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে আইন বদলাল, ১০০০ কোটি টাকা দিয়ে নির্ভয়া ফান্ড তৈরি হল, বলা হল ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন, পুলিশের টহলদারি ভ্যান, হাসপাতালে ২৪ ঘন্টার জন্যে কার্যকর ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, দ্রুত বিচার, এই সব কিছুর দ্রুত, খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেবে সরকার। এই দশ বছরে সেই সব ভাবনা কতদূর কার্যকর হয়েছে? সরকার কী করেছে একটু যদি দেখা যায়। সরকার বলতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যারা মেয়েদের জীবনে চাইলে অনেক বদল আনতে পারে, তারাই তো উদ্যোগ নেবে। যেমন পরিবহণ দপ্তর যদি যথেষ্ট পরিবহণের ব্যবস্থা করে, মেয়েদের অনেক ক্ষণ ফাঁকা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, হেনস্থার সম্ভাবনা কমবে। আবার শহরের উন্নয়ন দপ্তর পথেঘাটে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা করলে মেয়েদের ফিরতে দেরি হলেও চিন্তার কারণ কম হবে। আইন বিভাগের তরফে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের সংখ্যা বাড়ালে বিচার অনেক দ্রুত হবে। নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর থেকে উদ্যোগ নিয়ে মেয়েদের হেল্পলাইন যদি নিয়মিত চালু রাখা যায়, তা হলে মেয়েরা প্রয়োজনে এবং বিপদের মুখে নানা ভাবে সহায়তা পেতে পারে। এ ভাবে সরকারের নানা বিভাগ মেয়েদের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তার জন্যে কত খরচ হবে সেটা হিসেব করে সরকারের কাছে সে সব ব্যবস্থা রূপায়ণের জন্যে যা অর্থ লাগতে পারে তা জানায় এবং যদি বরাদ্দ হয়, তা হলে সে সব ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব।

যদি যথেষ্ট পরিবহণের ব্যবস্থা থাকত, তা হলে নির্ভয়া আর তার বন্ধুকে অচেনা বাসে লিফট চাইতে হত না। যদি পুলিশের পিসিআর ভ্যান আরও বেশি টহলদারি করত, তা হলে নির্ভয়া আর তার বন্ধু গুরুতর আহত অবস্থায় শীতের দিল্লির ফুটপাথে বিবস্ত্র পড়ে থেকে রক্তক্ষরণে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ত না। যদি পুলিশ সত্যি সত্যিই গুরুতর অসুস্থ নির্ভয়ার পাশে থাকতে চাইত, তা হলে ঘটনাটা কোন থানার আওতায় পড়ে, তা নিয়ে তর্ক করে দরকারি সময় নষ্ট করত না। যদি হাসপাতালেই কার্যকর ‘ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার’ বা এক ছাদের তলায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকত, তা হলে গুরুতর অসুস্থ আর আহত নির্ভয়ার বয়ান নেওয়া এক বারেই সম্ভব হত। শুধু বিচারটাই বলতে হয় তুলনায় দ্রুত হয়েছে, তাও হয়তো অভিযুক্তরা গরিব মানুষ বলেই, এবং জনগণ চেয়েছে বলে, না হলে প্রিয়দর্শিনী মাট্টুর ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে প্রমাণিত অপরাধী খালাস পেয়ে যেতে পারত না। তাই সরকারি বাজেটের জগতে মেয়েদের জন্য অর্থবরাদ্দ কতটা আর সেই অর্থ সত্যি সত্যিই সেই সব খাতে ব্যয় হয় কিনা অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

নারী নির্যাতন: সরকারি স্বীকৃতি

২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষাতে, যেখানে বাজেটপেশেরঠিকআগেঅর্থনীতিরবিবরণথাকে, সেখানে প্রথম লেখা হল যে এ দেশে প্রতি তিনজনে একজন মেয়ে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার, প্রতি ১৫ মিনিটে একটি মেয়ে ধর্ষিত হয়, ৬ কোটি ৩০ লক্ষ মেয়ে ভ্রূণহত্যার কারণে ‘হারিয়ে’ গেছে। আবার ২০১৯-২০ সালে নীতি আয়োগের দলিলে সরকারের মেয়েদের প্রতি বৈষম্য নিরসনের প্রতিজ্ঞাটি বিভিন্ন আইনি পরিবর্তন আর নীতি বদলের মাধ্যমে আবার উচ্চারিত হল, কিন্তু তার জন্যে সরকার বাজেটে কতটা বরাদ্দ রেখেছে, তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই। এই পরিসরে ২০১৮-২১, এই তিন বছরের বাজেট বিশ্লেষণ করে মেয়েদের সমতার দিকে কতটা এগিয়ে গেছে, তা দেখেছে অক্সফ্যাম-এর রিপোর্ট। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে সরকারের বাজেট সংক্রান্ত নথিতে যে সমস্ত প্রকল্প বা পরিষেবার ১০০ শতাংশ নারী ও শিশুকন্যার কাছে পৌঁছবে বলে প্রত্যাশিত, সেই সব প্রকল্প আর পরিষেবাকেই নারীকেন্দ্রিক বলে ধরা হয়েছে।

> সরকারের প্রতিশ্রুত মেয়েদের হেল্পলাইন, হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার তৈরি, স্ব-আধার গৃহ বা মেয়েদের আশ্রয় তৈরি, এ সব রূপায়িত করতে গেলে প্রয়োজন ১০ হাজার কোটি থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা!

বরাদ্দের হিসেবনিকেশ

দেখা যাচ্ছে ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ সালে নারীকেন্দ্রিক পরিষেবার অনুপাত বাজেটে একটু বেড়েছে, ০.০২% থেকে বেড়ে ০.০৭%। টাকার অঙ্কে ২০০৯ কোটি টাকা। কিন্তু সরকারেরই প্রতিশ্রুত ১৮১ বলে মেয়েদের হেল্পলাইন চালু করা, এক ছাদের তলায় পরিষেবা দেওয়ার জন্যে হাসপাতালেই ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার তৈরি, স্ব-আধার গৃহ বা মেয়েদের আশ্রয় তৈরি, এ সব রূপায়িত করতে গেলে প্রয়োজন ১০ হাজার কোটি থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা! ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, এই তিন আর্থিক বছর মিলিয়ে প্রায় সাড়ে আট কোটি মেয়ে পারিবারিক হিংসার শিকার হয়েছে যাদের আইনি সহ নানা সহায়তা প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রায় ২ কোটি মেয়ের অবিলম্বে চিকিৎসা সহায়তা আবশ্যক; ৫৪ লক্ষ মেয়ে যারা যৌন নিগ্রহের শিকার, তাদের শারীরিক আর মানসিক চিকিৎসা, আইনি সহায়তা প্রয়োজন, যে ২৭ লক্ষ নাবালিকা পাচার হয়ে গেছে বা পরিবারের মধ্যেই যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে, তাদের সুরক্ষার জন্যে আশ্রয়ের দরকার। এ সব কিছুতেই তো অর্থের প্রয়োজন, তার জন্যেই ওই ১০ হাজার কোটি থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। এই সব সংখ্যাগুলো পাওয়া গেল কী করে? চতুর্থ জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা আর তার সঙ্গে ২০১৮ সালের এনসিআরবি রিপোর্টে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের যে সব শতকরা হার পাওয়া গেল, তাকে ২০১৮ সালের জনসংখ্যার অনুপাতে হিসেব করে ওই তথ্যগুলো এসেছে।

কত অর্থ প্রয়োজন?

যে টাকার কথা বলা হয়েছে, তার বেশিটাই অবশ্য থাকবে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের হাতে। সেই সঙ্গে মেয়েদের হেল্পলাইন, এক ছাদের তলায় সব পরিষেবা, আশ্রয়কেন্দ্র বা মেয়েদের সরাসরি কাজে লাগবে, এ রকম পরিষেবা দেওয়ার জন্যে অন্য মন্ত্রকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দে নতুন থানা নির্মাণ, নানা স্তরের পুলিশকর্মী নিয়োগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আরও বেশি হাসপাতাল আর জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা, আইন মন্ত্রকের আরও বেশি করে আইনি সহায়তা কেন্দ্র আর আদালত তৈরি, এ সব রয়েছে। পুলিশ, আইন বিভাগ আর বিচার বিভাগকে আরও বেশি পুলিশ, বিচারক, আইনি সহায়তা কেন্দ্র আর সামাজিক ক্ষেত্রে আরও বেশি মানুষকে নিয়োগ করতে হবে যাতে তারা স্বচ্ছন্দে আর সহজে নির্যাতিত মেয়েদের বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছোতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে এখন মেয়েদের জন্যে যা বরাদ্দ, তা যদি সব মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়, তা হলে মাথাপিছু ৩০.৬৭ টাকা হবে, আর যদি ওই নির্যাতিত সাড়ে আট কোটি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তা হলে মাথাপিছু ১০২ টাকা হবে। যেমন স্ব-আধার গৃহে প্রতি আবাসিকের জন্যে (স্যাংশন অর্ডার অনুযায়ী) প্রতি দিনের খাবার খরচের জন্যে ৩১ টাকা ২৩ পয়সা বরাদ্দ। এই বরাদ্দ হলে সরকারি ব্যবস্থা নির্যাতিত মেয়েদের কীই বা পরিষেবা দিতে পারবে?

এখনও বিরাট ফারাক

এখন প্রতি এক লক্ষে ১০০ জন মেয়ে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পান। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র, এক ছাদের তলায় সব পরিষেবা বা স্ব-আধার গৃহগুলিতে এক লক্ষ মেয়ে পিছু আড়াইখানা শয্যা রয়েছে। নির্ভয়া তহবিলের চার ভাগের তিন ভাগ গেছে শুধু স্বরাষ্ট্র দপ্তরে, এবং তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি পেয়েছে দিল্লি, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র আর উত্তরপ্রদেশ। এই তহবিল কী করে আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে বরাদ্দ হতে পারে? এই ফাঁকগুলো মিটলে নির্ভয়ারা হয়তো আরও সহজে বিচার পেতে পারে। আর সেই সঙ্গে অবশ্যই মানুষের দেখার চোখ আর ভাবার মনগুলোকেও বদলাতে হবে।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক

মানবাধিকার শুধু খাতায় কলমে?

হেফাজতে মৃত্যু চলতেই থাকে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় যাবতীয় আইনকানুন উপেক্ষিত। লালন শেখরা শুধুমাত্র এক-একটি সংখ্যা। লিখছেন **সুজাত ভদ্র**

১৯৪৫ সাল। নাৎসিবাদের ভয়াবহ হত্যালীলা, ধ্বংসযজ্ঞ, নাগাসাকি-হিরোশিমাতে আমেরিকার পারমাণবিক বোমা বর্ষণ মানবসভ্যতা তথা মানবতাকেই ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সেই পটভূমিতে নবগঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি যেন আর পৃথিবীতে কোনও ভাবেই ফিরে না আসে। দেশে দেশে নাগরিকদের জন্য এক সর্বজনীন সুরক্ষা গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান পদক্ষেপ ছিল, দেশ, সমাজব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নির্বিশেষে সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির সপক্ষে অধিকারের নানা দিগন্ত নির্মাণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক রঘুবীর চক্রবর্তীর অধুনা বিস্মৃতপ্রায় ‘ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস’ শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কী ভাবে তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে পশ্চিমি উদারনৈতিক ধনবাদী দেশগুলোর আদর্শগত সংঘাত দানা বেঁধেছিল। দু’টি বিষয় ছিল কেন্দ্রবিন্দুতে: এক, মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কোনটা— স্বাধীনতা, যুক্তিবোধ, নাকি মানুষের মৌলিক চাহিদা— অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের স্থায়ী সমাধান। দুই, কোনটা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে সর্বজনীন ঘোষণায়? দীর্ঘ দু’বছরের অধিক কাল বিতর্কের শেষে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ‘মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা’ সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে এলিয়নর রুজভেল্ট সারা বিশ্বকে অবহিত করলেন। কোনও দেশ বিরোধিতা করেনি। ভারত এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে। প্রস্তাবনা ছাড়াও সর্বমোট ৩০টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত মানবাধিকারগুলোর চরিত্র ত্রিবিধ: প্রথম অংশে আছে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারগুচ্ছ, দ্বিতীয় অংশে অর্থনৈতিক ,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুচ্ছ। শেষ অংশে যুক্ত সমষ্টিগত অধিকার সমূহ।

এই আন্তর্জাতিক ঘোষণাটি কিন্তু নৈতিক অর্থাৎ তখনও স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর কাছে এই ঘোষণার কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরামহীন উদ্যোগের ফলে, আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনি কাঠামো গড়ে উঠেছে— নারীর অধিকার ও বাকস্বাধীনতার সপক্ষে, সব ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এমনকী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত ২০০২ সাল থেকে সক্রিয়। অবশ্য, ভারত, আমেরিকা, ব্রাজিল সহ একাধিক দেশ এতে স্বাক্ষর করেনি।

অত্যাচার: মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

রাষ্ট্র কর্তৃক মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের যে ক’টা উপাদান আছে তার মধ্যে অন্যতম, যে কোনও ধরনের রাষ্ট্রীয় হেফাজতে বন্দির উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। উক্ত মানবাধিকার ঘোষণায়, ১৯৬৬ সালের দু’টি সনদে, ১৯৮৪ সালের অত্যাচার-বিরোধী সনদে, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯০ সালে সাধারণ পরিষদের বন্দিদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালাতে বারবার বলা হয়েছে, অপরাধ চরিত্র-নিরপেক্ষ ভাবে, সমস্ত বন্দির প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে, এবং রাষ্ট্রকে স্বীকার করতেই হবে, প্রত্যেক বন্দির মানুষ হিসাবে অলঙ্ঘনীয় মর্যাদা আছে।

ভারতের আইনেও হেফাজতে হিংসা নিষিদ্ধ। ১৯৮৪ সালের অত্যাচার-বিরোধী কনভেনশন ভারত সংসদে অনুমোদন না করলেও, স্বাক্ষর করেছে। সুপ্রিম কোর্ট রায়ের পর রায়ে (যেমন শ্যামসুন্দর ত্রিবেদী মামলা (১৯৯৫), ডিকে বসু মামলা (১৯৯৭)) আইনরক্ষকদের হেফাজতে হিংসা, অত্যাচার, হত্যাকে নিকৃষ্টতম অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছে, অত্যাচারীদের শাস্তি ও অত্যাচারিতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি (যেমন নীলাবতী বেহরা মামলা) ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রের ‘সার্বভৌম অব্যাহতি’র (সভারেন ইমপিউনিটি) ক্ষমতাকে এ ক্ষেত্রে নস্যাৎ করেছে।

বিসিসিএল

তবু বাস্তবে?

বাধানিষেধ, নিয়মের দড়াদড়ি নিয়মিত উপেক্ষিত হয় বলেই লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকে লালন শেখরা। এনসিআরবি-র তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে ৭০টি হেফাজতে মৃত্যুর মধ্যে ৬৮টি র কারণ বলা হয়েছিল আত্মহত্যা বা অসুস্থতা। লালন শেখের ঘটনাতেও একই দাবি করা হয়েছে। তবে এই ঘোষণাটাও আইনসম্মত নয়। ২০২০ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক আদেশে বলা আছে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৬(১ ক) ধারা মোতাবেক বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত সম্পূর্ণ করার আগে কোনও এজেন্সি মৃত্যুর কারণ আগাম ঘোষণা করতে পারবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে সিবিআই এই আদেশ সচেতন ভাবে ভেঙে সত্য প্রকাশে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

অত্যাচারমুক্ত সমাজ সম্ভব?*

আমাদের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে কঠিন। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার গুরুতর অভাব রয়েছে। হেফাজতে লালন শেখের ‘অপমৃত্যু’-তে কোন দলের বেশি লাভ হল, তা নিয়ে চর্চায় ব্যস্ত নেতারা। বিচারাধীন বন্দিরও যে জীবনের অধিকার আছে, তা তাঁদের আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়। লালনরা মৃত্যুর তালিকায় এক-একটি সংখ্যা মাত্র, রাজনৈতিক জগতের কাছে নিছকই একটি বস্তু।

ফলে আমরা দেখতে পাই, হেফাজতে হিংসা ও হত্যা বন্ধ রোধ সংক্রান্ত ভারতের আইন কমিশনের ১৩২তম এবং ১৫২তম প্রতিবেদনে উল্লিখিত একাধিক সুপারিশের আইনি রূপ দেওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দলগুলোর নেই।

অত্যাচার ও আধুনিকতা

এটা একটা মিথ যে, প্রাক-আধুনিক যুগেই শুধু দৈহিক অত্যাচার ছিল ও যার প্রয়োগ হত প্রকাশ্য জনসমাবেশে। ১৯৯৩ সালে দারিয়ুস রেগালি তাঁর সাড়া জাগানো ‘টর্চার অ্যান্ড মডার্নিটি’ গ্রন্থে বলেছেন, মানবসভ্যতার আধুনিকতার নানা স্তরে অত্যাচার রয়েছে, তবে তার রূপটা হয়েছে গোপন (যদিও তারও ব্যতিক্রম আছে)। তবে সব রঙের আধুনিক রাষ্ট্র অত্যাচার ব্যবহার করে, প্রশ্রয় দেয় ও একই নিঃশ্বাসে অস্বীকার করে। তাই আত্মহত্যার, অসুস্থতার আখ্যান নির্মাণ করে। এর ফলেই অত্যাচারীদের সাজা থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অত্যাচারীদের মধ্যে পেশাগত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে। আধুনিক রাষ্ট্রে অত্যাচার হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি স্বাভাবিক, কোনও ব্যতিক্রম নয়। বিপরীতে, অত্যাচারিতর কাছে ন্যায়বিচার হয়ে ওঠে এক রহস্যময় মরীচিকা।

লেখক মানবাধিকার কর্মী

প্রতি সম্পাদক

বিসিসিএল

পড়ুয়ারা আরও সুরক্ষিত হোক

খবরে জানা গেল প্রতি স্কুলে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গঠিত হতে চলেছে ‘স্টুডেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি মনিটরিং কমিটি’। সেই কমিটিতে থাকবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অন্য শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক ছাড়াও পুলিশ প্রশাসন এবং পরিবার ও সমাজকল্যাণ দফতরের প্রতিনিধি। কমিটির কাজ পড়ুয়াদের নানা অসুখে দিকে লক্ষ রাখা, স্কুলের পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, সিসি ক্যামেরা ও শৌচালয় ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এই ভাবনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি প্রস্তাব: (১) যেহেতু পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা বলা আছে,তাই কমিটিতে একজন স্থানীয় চিকিৎসক রাখলে ভালো হয়। (২) এখন প্রায় সব পড়ুয়াদের হাতে হাতে স্মার্টফোন। তাই পড়ুয়ারা কিছুটা জেনে, বেশিটা না জেনে ভুল কাজ করে ফেলে। তাই পড়ুয়াদের সঠিক ভাবে স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। (৩) পড়ুয়াদের সচেতন করতে ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচির ভাবনা অবশ্যই ভালো। এ ছাড়া নাবালিকা বিয়ে রোধে ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ কর্মসূচি পালিত হোক সব স্কুলে। (৪) প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া শিশু শ্রমিক স্কুলগুলোকে চালু করার কথা ভাবা হোক। (৫) প্রতি স্কুলে ‘স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন’ থাকা বাধ্যতামূলক হোক। (৬) পড়ুয়ারা সাঁতার না জানার জন্য অনেক সময় বিপদ দেখা দেয়। পড়ুয়াদের সাঁতারের প্রাথমিক পাঠ দেওয়া হোক স্কুলে।

দীপংকর মান্না, আমতা, হাওড়া

ক্ষতিকর আবেগ

বিশ্বকাপ ফুটবলে পশ্চিমবঙ্গের মতো অন্য কোনও রাজ্যের মানুষ এমন মাতোয়ারা হয়েছিল কিনা জানা নেই। আর্জেন্টিনার জয়লাভে সর্বত্র এত বাজি পুড়েছে, যা দেওয়ালির রাতকেও হার মানায়। শুধু বাজি নয়, এত বিপুল অর্থের মদ বিক্রি হয়েছিল যা সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। খেলা চরিত্র গঠন করে, সর্বোপরি শরীরস্বাস্থ্য গঠনে সহায়তা করে। সেই খেলার আবেগে আমরা যদি এমন কুকাজে মেতে উঠি, তা আমাদের পরিবেশ ও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে। নাগরিকদের ভেবে দেখার আবেদন করব।

স্বপন কুমার ঘোষ, আন্দুল, হাওড়া